২০২১ সালের বাংলাদেশ

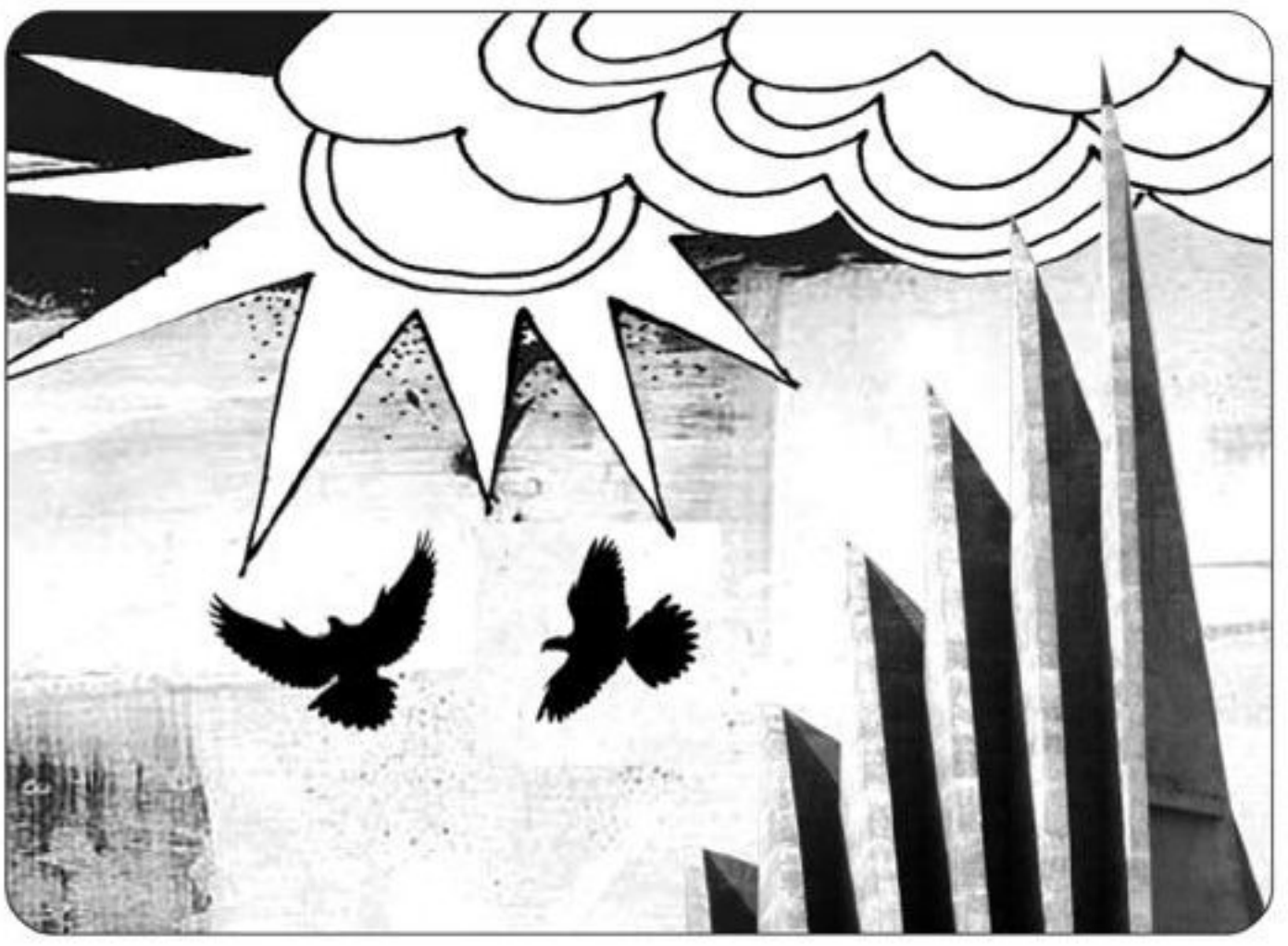

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অগ্নিঝরা মার্চ। ৭ মার্চের মাস। ১৭ মার্চের মাস। স্বাধীনতা দিবসের মাস। সত্তরের নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে বলেছিলেন, "১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলন ছিল না, বাঙালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত ছিল।" ২০১৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সামাজিক রাজনীতির ইতিবাচক বাঁকে এবং সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের ধারাবাহিকতায় বলিষ্ঠ নিশ্চিত পদচারণা প্রত্যক্ষ করেছে। চৌষট্টি বছর আগে মহান একুশের চেতনা, মায়ের ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সাময়িক ব্যর্থতার গ্লানি অগ্রাহ্য করে সংগ্রামকে ধাপে ধাপে আরও বেগবান করা এবং সাফল্যের বরমাল্য বাঙালী জাতিকে নতুন উপলব্ধি ও প্রত্যয় এনে দিয়েছিল। এরপর চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়ের পর ছাপ্পান্নর সংবিধানে আংশিক হলেও সফলতা অর্থাৎ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে পারার ঘটনাও তাৎপর্যবহ। আটান্নর সামরিক আইনবিরোধী দুর্বার গণআন্দোলন, বাষট্টিতে বাঙালীর শিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিনাশকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র রক্তক্ষয়ী সফল সংগ্রাম, ছেষট্টিতে বাঙালীর মুক্তি সনদ ছ'দফার আত্মপ্রকাশ, ১১ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং গৌরবোজ্জ্বল একাত্তর ও মহান স্বাধীনতা। এর প্রতিটি ধাপে একুশের চেতনা বাতিঘর হয়ে পথ দেখিয়েছে বাঙালীকে।

নরওয়ের অর্থনীতিবিদ ড. জাস্ট ফাল্যান্ড ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জ্যাক পারকিনসন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আদৌ টিকবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ড. হেনরী কিসিঞ্জারসহ অন্যান্য রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিশ্লেষকগণও দেশটির জন্মের পরই বাংলাদেশ সম্পর্কে আপত্তিজনক নেতিবাচক মন্তব্য করেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, কোনমতে ভূখন্ড ও জনগোষ্ঠী টিকে থাকলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না। হয়ে যাবে তলাবিহীন ঝুড়ি। ১৯৭৬ সালে ড. ফাল্যান্ড ও ড. পারকিনসন তাদের 'বাংলাদেশ এ টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট' বইতে উল্লেখ করেন, 'এই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে তাহলে দুনিয়ার যে কোন দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারবে।' তাদের এই নেতিবাচক বক্তব্যকে যে বাংলার মানুষ মিথ্যা প্রমাণ করেছে তা উপলব্ধি করেই ২০০৭ সালে এই দুই অর্থনীতিবিদ সংশোধনী দিয়ে বলেন, "গত তিন দশক বা তারও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ সীমিত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।"

২০১২ সালের ৩ নবেম্বর দ্য ইকোনমিস্ট 'আউট অব দ্য বাসকেট' শিরোনামের এক বিশ্লেষণে বলে, 'কী করা যায়, সেটি দেখিয়ে দেয়ার মডেলে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। কি করে উন্নয়নের মডেলে পরিণত হওয়া যায়, সেটি দেখিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।'

২০১৫ সাল ও তার আগের স্থিতিপত্র

২০১৫ সালের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চহারে, এর সামাজিক রূপান্তরে এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে বিশ্ববাসী আগের ছ'সাত বছরের মতো বিস্মিত না হয়ে অভ্যস্ত হয়ে একে বাংলাদেশ বৈশিষ্ট্য (Bangladesh Phenomenon) হিসেবে মেনে নিয়েছে। বিগত অর্থবছরে জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা সাত ভাগে পৌঁছে গিয়ে থাকতে পারে। সিএনএন মানিগ্রাম বলছে ২০১৫ সালে পাঁচটি দ্রুততম প্রবৃদ্ধির দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০১৯ সালে দেশটি গণচীন ও ভারবর্ষের সঙ্গে দ্রুততম প্রবৃদ্ধির তিনটি দেশের মধ্যে থাকবে। ব্লুমবার্গের মতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তিনটি দ্রুততম প্রবৃদ্ধির দেশে উন্নীত হয়েছে ভিয়েতনাম ও ভারতের সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রের পিইইউ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে আগামী পঁচিশ বছরে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটির মাপে পৃথিবীর তেইশতম বৃহৎ অর্থনীতি হবে (বর্তমানে চৌত্রিশতম) বাংলাদেশ এবং অর্থনীতির আকারে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে। মাস্টার কার্ডের জরিপ অনুসারে ২০১৫ সালের শুরুতে এশিয়া প্যাসিফিকের ১৬টি দেশের মধ্যে কনজুমার কনফিডেন্স ইনডেক্সের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ১৬.৯ শতাংশ, যা মোট ৮৩.৩ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। দেশের শতকরা ৭২ ভাগ লোক নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে সন্তুষ্ট এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আশাবাদী। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট দলীয় থিংক ট্যাংক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন হিসাব করছে যে, ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল ও কৃতসংকল্প পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ ২১টি দেশের মধ্যে মোবাইল সক্ষমতায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। ২০১৬ সালে ৪জি শুরু হয়ে গেলে অবস্থানটি আরও মজবুত হবে। বর্তমানে দেশের ৮৭% লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। যদিও মোবাইল ফোনের মালিকানার চেয়ে অনেক কম।

শিল্প উৎপাদন সক্ষমতা বিষয়ে জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা UNIDO কর্তৃক হিসাবিত Competitive Industrial Performance Index (CIP) অনুসারে ২০০টি দেশের মধ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮০; ২০১৩ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭-এ উঠে আসে।

এদিকে বিদ্যুত উৎপাদন ও সঞ্চালনার দৃষ্টিনন্দন সক্ষমতার ইতিবাচক প্রবাহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছে। বস্টন কনসালন্টিং গ্রুপ বিসিজি ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো কয়েকটি দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশে এখন এক কোটি বিশ লাখ লোক বার্ষিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার উপার্জনকারী ভোক্তাপণ্যের শক্তিধর চাহিদার উৎস, যা ফি বছর শতকরা দশ ভাগ হারে বাড়বে। অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ খুবই চমৎকার ক্ষেত্র। অন্য একটি গবেষণামতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ও হার কমছে (বর্তমানে শতকরা ২১ ভাগ) অর্থাৎ দারিদ্র্যকে পিছনে ফেলে ভোগ্যপণ্য চাহিদা বৃদ্ধিকারী মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৭২ সালে ৭.৫ কোটি জনসংখ্যার ৫.৫ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিলেন আর ২০১৫ সালে ১৬.৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৩.৫ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছেন অর্থাৎ দরিদ্র মানুষ ভাগ্য উন্নয়ন করে মধ্যবিত্তের কাতারে যাচ্ছেন বিপুল সংখ্যায়। আর মধ্যবিত্তদের অনেকেই আরও উপরের সোপানে যাচ্ছেন। দেশে কোটিপতির সংখ্যা এখন প্রায় ৫৪,০০০ (মতান্তরে সোয়া লাখ) এবং প্রতিবছর আরও পাঁচ হাজার লোক নতুন করে কোটিপতি হচ্ছেন। ড. বিনায়ক সেন ও বিআইডিএসের একটি গবেষণা সমীক্ষায় দরিদ্রদের মধ্যবিত্তদের কাতারে উঠে আসার কথা বলা আছে, যদিও এতে ব্যক্তি আয় ও আঞ্চলিক আয়ে বিপুল বৈষম্যের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ আর জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর আরও বেশি অর্থবহ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এখন মধ্যম পর্যায়ে (এইচডিআই ভ্যালু ০.৫৩৫) উঠে এসেছে। অবস্থান ১৪২তম স্থানে; পাকিস্তান, নেপাল ও আফগানিস্তান নিম্ন মানবসম্পদ সূচকে। প্রশ্ন উঠেছে স্বল্পোন্নত দেশ বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রির বিড়ম্বনা থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উঠে আসা উচিত কিনা এবং তাতে কত সময় লাগতে পারে। অবশ্যই ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের আগেই উন্নয়নশীল দেশ তথা মধ্যম মানব উন্নয়ন সূচকের আরও উপরের দিকে উঠে আসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং যদি সাম্প্রতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকে তবে তা অর্জিত হবেই।

স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে গ্রাজুয়েশন করতে জাতিসংঘের তিনটির মধ্যে দুটো সূচকে উত্তীর্ণ হতে হবে, যথা- (ক) মাথাপিছু আয় বিশ্বব্যাংকের অ্যাটলাস পদ্ধতিতে ১২৪২ মার্কিন ডলার হতে হবে (খ) মানবসম্পদ সূচক হিউম্যান এসেট ইন্ডেক্স ৬৬.০ হতে হবে (বর্তমানে ৬৩.৮) এবং (গ) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে (ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স) হতে হবে ৩৩.৪-এর কম। এর মধ্যে ২০১৫ সালে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হয়েছে ২৫.১। মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক এখন ৬৩.৮ এবং শীঘ্রই কাঙ্ক্ষিত ৬৬-তে উঠে গেলেই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় আসীন হবে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালের পর্যালোচনায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ পর্যায় থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় আসীন করে দিতে পারে।

সামাজিক অগ্রগতি

সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সূচকের শীর্ষ অবস্থানে। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা ১.১৩ ভাগ, নারীর প্রজনন প্রবণতা নেমে এসেছে ২-এ । শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৩১, প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগ, ঝরে পড়ার হার শতকরা ২১ এবং হ্রাসমান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত জনমিতির অনুরূপ, উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরতদের সংখ্যা প্রায় ৩১ লাখ অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ০২ শতাংশ এবং সমবয়সীদের এক-পঞ্চমাংশ। চুয়াল্লিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী সংখ্যা বেড়েছে ১০০ গুণ। জন্মকালীন গড় আয়ু এখন প্রায় ৭২ বছর। তবে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার অনেক হ্রাস পেয়েও এখন প্রতি লাখ জন্মে ৯১; এ দুর্বলতাকে কাটাতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ। নারী শিক্ষায় অগ্রগতি, নারী নেতৃত্বাধীন পরিবারের সাফল্য এবং চাকরি ক্ষেত্রে নারীর দৃশ্যমান উপস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক। তবে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বেই নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়ন ঘটায়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই নারী জাগরণে আরও অনেক দূর যেতে হবে। সংসদে ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনও শতকরা ১০ ভাগের নিচে (৩০০-এর মধ্যে মাত্র ২১)। রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কর্মকর্তা নির্বাচনে এবং সব ধরনের নির্বাচনে নারীর মনোনয়ন এখনও নগণ্য অনুপাতে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্স ২০১৫ প্রকাশ করে দেখিয়েছে যে, ২০১৪ সালের সূচকের তুলনায় বাংলাদেশ চার ধাপ এগিয়ে ৬৮তম থেকে ৬৪তম স্থানে উঠে এসেছে। ২০১৫ সালের সূচকে আইসল্যান্ড প্রথম স্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য উল্লেখযোগ্য দেশ ভারতের অবস্থান ১০৮। তবে এই সমীক্ষায় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সূচকে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ৮ম, এখানে আরও শক্তি যোগ করা কঠিন হবে না। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের ২০১৫ সালের সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, ২০০৩ সালে বাংলাদেশে মোট নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ১২,২৯,৪১৩ অর্থাৎ মোট কর্মজীবীর শতকরা ১০.৯১ শতাংশ। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০,৫১,৭১৮, যা মোট কর্মজীবীর ১৬.২৪ শতাংশ। তবে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিয়ে দোদুল্যমানতা রয়েছে তা দৃঢ়ভাবে দূর করে 'আঠারোর আগে বিয়ে নয়' আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা জরুরী। গৃহস্থালি কর্মকান্ডকে সামষ্টিক আয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে; কাজটি খুবই দুরূহ। তাই অপেক্ষা করতে হবে। তবে অন্তর্ভুক্তির সন্ধান শুরু করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে শিক্ষার হার ১৯৭২ সালে ছিল শতকরা ২৪ ভাগ। ২০১৩ সালে এই হার শতকরা ৬১ ভাগে উন্নীত হয়।

লন্ডনভিত্তিক চাইল্ড রাইটস ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কের (সিআরআইএন) সূচক অনুসারে শিশুদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২০০ দেশের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় ও ১০ম স্থানে রয়েছে বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন ও কেনিয়া। আর ৪৩তম, ৬৩তম, ৭৮তম, ৮৫তম ও ১৮৯তম স্থানে অবস্থান করছে ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ।

অর্থনৈতিক চিত্র

বাংলাদেশের কৃষি ও মৎস্য খাতের ধারাবাহিকতা চমৎকারিত্বের দাবিদার। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন ছিল ০১ (এক) কোটি টন; ২০১৫ সালে তা ৩.৭৫ (পৌনে চার) কোটি টন, যদিও কর্ষণযোগ্য জমি কমে গেছে শতকরা ১৫ ভাগ। দ্য ইকোনমিস্টের ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিকস ২০১৩ প্রকাশনীতে খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশকে ১০তম স্থানে দেখানো হয়েছে। ২০১৩ সালের ঐ হিসাবে কোটি টনের অঙ্কে খাদ্যশস্য উৎপাদন গণচীন (৫৫.১১), যুক্তরাষ্ট্র (৪৩.৭), ভারতবর্ষ (২৯.৩৯), ব্রাজিল (১০.১), রাশিয়া (৯.০৩), ইন্দোনেশিয়া (৮.৯৭), ফ্রান্স (৬.৭৫), কানাডা (৬.৬৩), ইউক্রেন (৬.৩১) এবং বাংলাদেশ (৫.৫)। গত পঁচিশ বছরে আলুর মোট ফলন ০৯ (নয়) লাখ ম্যাট্রিক টন থেকে ৮৩ (তিরাশি) লাখ টনে উঠে এসেছে; পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী দেশ। ভারত ও রাশিয়া বাংলাদেশের আলু রফতানিতে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছে। ভিয়েতনামে বাজার পাওয়া যেতে পারে। আলু থেকে উন্নতমানের চিপস আর ফ্রাই বানাতে না পারার কোন কারণই নেই। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীতে ৫ম; বার্ষিক চাহিদা ৪১ লাখ টন, উৎপাদন প্রায় ৩৮ লাখ টন; তন্মধ্যে ইলিশ ৩৮০০০ টন। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার হিসাবে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ মোট ০৩ লাখ টন থেকে ২২ লাখ টনে উন্নীত করেছে, যা পৃথিবীতে ৪র্থ বৃহত্তম।

বাংলাদেশের রফতানি আয় সকল হিসাব-কিতাবকে ছাড়িয়ে ২০১৫ সালে ৩১০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বহুমাত্রিকতা এখনও আসেনি। তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে রফতানি আয় মোট রফতানি আয়ের অংশ ২০১৪ সালের ৭৬ শতাংশের তুলনায় ২০১৫ সালে ৮১ শতাংশে উঠে আসে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্য ক্রেতাগণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাককিনসে এ্যান্ড কোম্পানি পরিচালিত জরিপে আগামী পাঁচ বছরে শীর্ষ তিনটি সরবরাহকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শতকরা ৪৮ ভাগ তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার আমদানিকারক দেশের পছন্দ বলে গণ্য হয়। অন্যদের মধ্যে ভিয়েতনাম শতকরা ৩৩ ভাগ, ভারতবর্ষ, মিয়ানমার ও তুরস্ক শতকরা ৩০ ভাগের পছন্দ বলে উঠে আসে।

তবে বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনে আধুনিক ও বহুমাত্রিক ঝুঁকি হ্রাসকারী ফ্যাক্টরিং মেথড কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না তাইবা কে জানে!

লেখক : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক